এক বাকসো ভূত

সম্পাদনা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ❑ অশোককুমার মিত্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূত নিয়ে ভূমিকা

ভূত আছে কি নেই. এ নিয়ে বিতর্কে যাবার আগে স্বীকার করি-ভৌতিক রসের অভাব নেই কোনো কালেই। শুধু এদেশে কেন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কত না গল্প আছে ভূতের। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে ভূতের কোনো ভবিষ্যৎ নেই এমন ভাবাও ঠিক হবে না। কারণ. ভূত বাদ দিয়েও ভূতের গল্পের চাহিদা বাড়ছে বই কমছে না। শুধু বিজ্ঞানের বিবর্তনের মধ্যে ভূতের চালচলন পাল্টেছে কিছুটা. পরেও অনেকটা বদল হবে, হয়তো।

ভূতের গল্প পেলে ছাড়তে চায়না নাস্তিকরাও। দিন কালের সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরাও পাল্টেছে। এখন শুধু কুলোর মতো কান কিংবা মূলোর মতো দাঁত আর চুলোর মতো চোখ দেখিয়ে ভয় দেখানো যায় না। সূক্ষ্ম বুদ্ধিরও পরিচয় দিতে হয় কম বেশি। বাংলা সাহিত্যের সেই সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রের কলমেই প্রকাশিত হয়েছিল একটা প্রশ্ন. 'ভূত কিসে হয়'? এই বিষয়ে তাঁর পরিচিত এক পণ্ডিতমশাই শুধু জানতেন. 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করলে ভূত হয়। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের পাঠকেরা জানতেন, অন্ধকার জমে ভূত হয়। তাই বরফকলের অনুকরণে অন্ধকার জমানোরও' একটা আইডিয়া দিয়েছিলেন লেখক। কিন্তু পরবর্তী যুগে এলেন পরশুরাম। ছদ্মনামের আড়ালে রাজশেখর বসু ছিলেন আসলে বিজ্ঞানী। তাই তাঁর ভূতের গল্পের মধ্যেও প্রেততত্ত্বের খাঁটি মনোগ্রাফের সন্ধান মিলেছে। তিনিই জানিয়েছেন, নাস্তিকদের আত্মা নেই। তারা মরলে অক্সিজেন কিংবা হাইড্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু আস্তিকরা ইহলোকে বুসব্যাস্ করে ভূত হয়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব। প্ল্যানচেটের আসর বসত শান্তিনিকেতনের উদয়নে। কবির সঙ্গে বিদেহী আত্মাদের কথোপকথন তুলে রাখা আছে আটটি খাতায়। তিনি বলতেন, 'পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই

বলে সে সব নেই? কতটুকু জানো? জানাটা একটুকু। না জানাটাই অসীম।' বাংলা সাহিত্যে ভূত-লিখিয়েদের লেখাপত্তর ঘেঁটে দেখা গেছে তাঁদের সৃষ্ট ভূত-প্রেতের নিজস্ব একটা সমস্যা আছে সব সময়। ভয় দেখিয়ে যাদের জীবিকা অর্জন করতে হয় এদেশে তাদের ঝামেলাও কম নয়। বাঙালী লেখকদের মুস্কিল অন্য জায়গায়। কবর আর কফিনের অভাবে তাঁদের ভূতেরা বিপদে পড়ে হাজার রকম। অথচ বিদেশের গবলিন, নোম, জিন, জোম্বিয়া, বাকুরু, রোলাং, আর ভ্যাম্পায়াররা ভূত সমাজে বেশ জমজমে, ছমছমে। তাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। কবর আর কফিন থাকলে বাঙালী ভূতেরাও বোধহয় পাল্লা দিতে পারত ওদের সঙ্গে। গ্যেটে, বায়রন, গ্যাতিয়ের বা বদেলেয়ারের ভ্যাম্পায়ারাও নিশ্চয় মাথা হেঁট করত ত্রৈলোক্যনাথের লুল্লুর কাছে। আলেকজান্দার দুমা, পুশকিন কিংবা মোপাসাঁর প্রেতাত্মারাও হয়তো হার মানত পরশুরামের পেনেটির মেনিমুখো শিবু ভট্টাচার্য্যির পাল্লায় পড়লে।

তাই সেকাল থেকে একালের একশো পঁচিশ রকম বাঙালী ভূতেরাই রইল এই জমকালো একটা বাকসোর মধ্যে। রইলেন একশো পঁচিশজন ডাকসাইটে বাঙালী লেখক। শুধু ছোটদের নয়, আমার বিশ্বাস সব বয়েসের সবরকম পাঠককেই খুশি করবে 'এক বাকসো ভূত'। এই সংকলনটি সকলের হৃদয় জয় করলে সার্থক হবে আমাদের পরিশ্রম। সম্মানিত হবে বাংলা শিশুসাহিত্য।

কলকাতা বইমেলা, ১৯৯২

প্রসঙ্গ: এক বাকসো ভূত

বাবা! সোজা কথা কি? একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে এক বাকসো ভূত! এই মাগ্‌গি গন্ডার বাজারে এক বাকসো ভূত ধরা কি সহজ কাজ? আর, এ কাজ কি দু'জন একজনের? তবে কাজ করতে নেমে বুঝেছি কাজটা কঠিন হলেও বেশ মজার। ভূত নিয়ে যত তক্কোই থাক, ভূতের গল্প পড়তে চায় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। আর, বিজ্ঞান যতই এগোক না কেন, ভূত নিয়ে গা-ছম ছম ব্যাপার একটা আছেই। আসলে সেই গা-ছম ছম অনুভূতিটাই ভূতের গল্পের চালচিত্র, তাই, ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেও অনেক লেখক ভূতের গল্প ফেঁদেছেন ঐ চালচিত্রটাকে জম্পেশ করে বেঁধে নিয়ে।

ভূতের গল্পে কোনও দেশ-কালের ভেদ নেই। আলাদা প্রজাতি হিসেবে প্রাণী জগতে চিহ্নিত হবার পরে মানুষ প্রায় একই সঙ্গে ভূত আর ভগবানকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য এই দু'জন সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ-ভয়-কৌতুহল সমানভাবে বেড়েছে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূতের অস্তিত্বে কারো কারো সন্দেহ দেখা দিলেও, ভূতের গল্পে কিন্তু কারো আকর্ষণ তিলমাত্র কমেনি। পাশ্চাত্য দেশে, যেখানে ফলিত-বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষে পৌঁচেছে, সেখানেও ভূতের গল্পের টান এতটুকু কম নয়। এ দেশেও অবস্থাটা ঠিক তাই। একশো বছর আগে রেড়ির তেলে প্রদীপ জ্বেলে ভূতের গল্প যেমন লেখা হয়েছে, আজ বৈদ্যুতিক ফ্লুরোসেন্ট-এর স্নিগ্ধ আলোয় ঠিক তেমনই ভূতের গল্প লিখছেন আধুনিক গল্পকারেরা। সেদিনের পাঠক শ্রোতার মত আজকের পাঠক ও শ্রোতারা সেই সব গল্প সমান আগ্রহে গোগ্রাসে গিলছেন। ভূতের গল্পের টান অনেকটা কাঁঠালের আঠার মত, পড়া শুরু করলে শেষ না করে আর ছাড়া যায় না।

এক বাকসো ভূতের গল্পে যেমন অবিশ্বাসীর ভূত আছে, ঠিক তেমনি অতি বিশ্বাসীরও ভূত রয়েছে। আছে বেঁটে ভূত, লম্বা ভূত, গেছো ভূত, সেজো ভূত, মেজো ভূত, বাঁকা ভূত, রোগা ভূত, মোটা ভূত, হামদো-মামদো ভূত, হরেক রকম ভূত। কোনও ভূত ভয়ঙ্কর—চোখগুলো তার চুলোর মত, দাঁতগুলো তার মূলোর মত, কানগুলো তার কুলোর মত—শুধু চেহারায় নয়, চাল-চলনেও তাদের ভয় দেখানো ভয়ঙ্কর। আবার কোনও কোনও ভূত মজার, তারা দাবা খেলে, গান শোনায়, চেহারাখানা দিব্যি ফুরফুরে বাবু মানুষটির মত। চালচলনে কোনও খুঁত নেই শুধু প্রাণটি-ই যা ভূত। সব জাতের ভূত মিলে মিশে এখানে একাকার। এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'সে' থেকে গা হারানো মানুষটিও চেপে চুপে দিব্যি ভূতের বাকসে ঢুকে বসে গেছে।

এই সঙ্কলনের একেবারে প্রথম গল্পটি রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র লেখা। লেখা হয়েছিল বাংলায় প্রচলিত একটি জনপ্রিয় লোককথা অবলম্বনে। রেভারেন্ড দে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক। লোককথাটি বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচলিত ছিল তার বহু আগে থেকেই। সেই পুরনো লেখার পাশাপাশি একবিংশ শতকের দ্বার প্রান্তে একেবারে হালে লেখা টাটকা কিছু গল্পও এ সঙ্কলনে আমরা রেখেছি। পুরনো গল্পের আকর্ষণ আজও একই রকম রয়েছে, আদৌ কমে নি। লিখতে লিখতে লেখক ক্লান্ত হয় নি, পাঠকও ভূতের গল্পে আগ্রহ হারান নি। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকেরা এখনও বিশেষ 'ভূত সংখ্যা' প্রকাশ করেন, আর মুখরোচক গরম তেলেভাজার মত তা মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়।

মোটামুটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের শুরু থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বের বাংলা ভূতের গল্পের একটি পুরো পরিচয় এখানে দু মলাটের ভেতর বন্দী করা গেছে। অবশ্য, এ গল্প বাছার সময়ে শিশু ও কিশোর পাঠকদের কথাই আমাদের মনে ছিল। তবে সৎ সাহিত্যের আকর্ষণ তো কোনও বয়সের সীমানায় বাঁধা থাকে না, ফলে বয়স্ক পাঠকও যে এসব গল্প পাঠে গভীর আগ্রহ বোধ করবেন এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আরেকটি কথা, একটি শব্দ হয়তো বিভিন্ন বানানে দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন লেখায়। মনে হতে পারে এটাও কোনও ভূতের খেলা, ছাপাখানার ভূতের, কিন্তু ঘটনা তা নয়। আমরা সাধারণত লেখকের পছন্দের বানানটাই রাখতে চেষ্টা করেছি। আর তার ভেতর দিয়ে বানানের বিবর্তনেরও একটা ধারা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

গোড়াতেই বলেছি, এক বাকসো ভূত ধরা দু'একজনের কম্মো নয়। লেখকবন্ধু শৈলশেখর মিত্র, সুধীন্দ্র সরকার, রূপক চট্টরাজ অনেক ভূতের সন্ধান এনে দিয়ে আমাদের কাজ অনেকখানি সহজ করে দিয়েছেন। পুনশ্চ-র তরুণ কর্ণধার এই বিপুলায়তন গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছেন দেখে বিস্মিত বোধ করছি।

যাদের জন্যে আমাদের এই ভূত ধরার উদ্যোগ, বাকসো খুলে যদি তারা খুশি হয় তবেই এ শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত—

অশোককুমার মিত্র

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৯২

সূচীপত্র

লালবিহারী দে	ভীতুভূত	১-৩
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	পিঠে পার্বণে চীনে ভূত	৪-১৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সে	১৪-১৮
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	জোলা আর সাতভূত	১৯-২৪
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	ভূতের বিপদ	২৫-২৭
কুলদারঞ্জন রায়	ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ	২৮-৩০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভূত পত্‌রীর দেশ	৩১-৪৩
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	খুড়া মহাশয়	৪৪-৫৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	লালু	৫৫-৫৯
ললিতমোহন ভট্টাচার্য	রামায়ণ গান	৬০-৬৫
পরশুরাম	মহেশের মহাযাত্রা	৬৬-৭৭
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বরযাত্রী ভূত	৭৮-৮৩
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	নরক এক্সপ্রেস	৮৪-৯১
সুকুমার রায়	সূর্দন ওঝা	৯২-৯৬
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	কঙ্কালের টঙ্কার	৯৭-১১১
হেমেন্দ্রকুমার রায়	কে?	১১২-১১৭
নরেন্দ্র দেব	মণ্টির মা	১১৮-১২৩
সুবিনয় রায়	পিস্তলের গুলি	১২৪-১২৯
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মায়া	১৩০-১৪০
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	বদনপুর বাংলোর সেই রাত	১৪১-১৪৬
মণীন্দ্রলাল বসু	উচ্চৈঃশ্রবা	১৪৭-১৫৪
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বর্ণ ডাইনির গল্প	১৫৫-১৫৮
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	রাতের অতিথি	১৫৯-১৬৪
পরিমল গোস্বামী	ভূত বনাম ভূত	১৬৫-১৭০
বনফুল	ভূতের গল্প	১৭১-১৭৩
মনোজ বসু	বউমা	১৭৪-১৭৮
সুকুমার সেন	ভয় ও ভূত	১৭৯-১৮৩
প্রমথনাথ বিশী	ফাঁসিগাছ	১৮৪-১৮৭
স্বপনবুড়ো	ঠাকুর্দার হুঁকো	১৮৮-১৯৭
শিবরাম চক্রবর্তী	এক ভুতুড়ে কাণ্ড	১৯৮-২০২

সরোজকুমার রায়চৌধুরী	একটি সত্যকার ভূতের গল্প	২০৩-২১২
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	অলিখিত দলিল	২১৩-২১৯
জরাসন্ধ	নিজাম কাঁদির বিল	২২০-২২৩
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	হানাবাড়ি	২২৪-২৩৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র	মাথায় চন্দ্রবিন্দু	২৩৪-২৪৫
মনোরম গুহঠাকুরতা	অদ্ভুত আকর্ষণ	২৪৬-২৫০
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	হানাবাড়ীর খপ্পরে	২৫১-২৬৩
প্রবোধকুমার সান্যাল	ডাক্তারের সাহস	২৬৪-২৬৯
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	তৈলচিত্রের ভূত	২৭০-২৭৮
প্রভাতকিরণ বসু	পাথরো নদীর ওপারে	২৭৯-২৮২
বুদ্ধদেব বসু	দুই বন্ধু	২৮৩-৩০১
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	ছুটি	৩০২-৩০৯
লীলা মজুমদার	কর্তাদাদার কেরদানি	৩১০-৩১৬
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	মড়াকাটার ভয়ে	৩১৭-৩২৬
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	খট্টাসডাহিঁর বাংলো	৩২৭-৩৩৪
আশাপূর্ণা দেবী	নিজে বুঝে নিন	৩৩৫-৩৫৫
সুমথনাথ ঘোষ	ম্যাজিকের ভূত	৩৫৬-৩৬৪
সুকুমার দে সরকার	ভূতো	৩৬৫-৩৭২
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত	কুকুরটা	৩৭৩-৩৮৬
ভবানী মুখোপাধ্যায়	সিংহগড়ের ভূত	৩৮৭-৩৯০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	আকস্মিক	৩৯১-৩৯৪
বিমল মিত্র	রাত তখন এগারোটা	৩৯৫-৪০১
ধীরেন্দ্রলাল ধর	একরাত্রি	৪০২-৪০৭
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	টান	৪০৮-৪১৪
শ্রীধর সেনাপতি	ভূতের ভয়	৪১৫-৪২২
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ভূতুড়ে	৪২৩-৪২৮
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী	চোখ	৪২৯-৪৩৪
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	পিন্‌ডিদার মানবিক ভূত	৪৩৫-৪৪৯
শ্রীশামুক	ভেতরে ও কে	৪৫০-৪৫৩
সমরেশ বসু	উত্তর সিকিমের ভূতবাংলো	৪৫৪-৪৬১
সত্যজিৎ রায়	টেলিফোন	৪৬২-৪৬৬
বিমল কর	সত্যি ভূতের গল্প	৪৬৭-৪৭২

দৃষ্টিহীন	সাহেব ভূতের আংটি	৪৭৩-৪৮০
শিশিরকুমার মজুমদার	ঘড়ি	৪৮১-৪৮৭
মহাশ্বেতা দেবী	ভুলো ভূত	৪৮৮-৪৯২
মঞ্জিল সেন	ত্র্যহস্পর্শ	৪৯৩-৪৯৮
হিমানীশ গোস্বামী	আলো-আঁধারি	৪৯৯-৫০৪
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	ভৌতিক কাহিনী	৫০৫-৫০৯
শৈলেন ঘোষ	আর এক ছেলেমানুষ ভূত	৫১০-৫১৩
অমিতাভ চৌধুরী	হুড়কো ভূত	৫১৪-৫২১
কার্ত্তিক মজুমদার	সেই বুড়ো লোকটি	৫২২-৫৩০
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	অভিশপ্ত কঙ্কাল	৫৩১-৫৪৬
মানবেন্দ্র পাল	রহস্যকুঠির রাণী	৫৪৭-৫৫৫
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	তিন নম্বর ভূত	৫৫৬-৫৬২
পূর্ণেন্দু পত্রী	কালোপনিক ভূত	৫৬৩-৫৭১
রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়	ভূতের সন্ধানে	৫৭২-৫৭৫
অদ্রীশ বর্ধন	ভূতোকাশি সিরাপ	৫৭৬-৫৮২
আলোক সরকার	সঙ্গী	৫৮৩-৫৮৮
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	গয়া প্যাসেঞ্জারের ভূত	৫৮৯-৫৯৬
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	জয়ের দাদু	৫৯৭-৬০২
প্রফুল্ল রায়	পাগল মামার চার ছেলে	৬০৩-৬১০
প্রলয় সেন	ছেলেবেলার ভূত	৬১১-৬১৫
আনন্দ বাগচী	ভূতুড়ে রসিকতা	৬১৬-৬২৪
বিকাশ বসু	ভূতেরা এরকমই হয়	৬২৫-৬৩১
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	বটুকদাদার পাখি	৬৩২-৬৩৮
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	কার হাত?	৬৩৯-৬৪৮
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	গগনের মাছ	৬৪৯-৬৫৪
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়	একেই কি বলে কুয়াশা	৬৫৫-৬৬৩
মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়	কবন্ধের কবলে	৬৬৪-৬৬৬
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	কৃপণ	৬৬৭-৬৭২
সমীর রক্ষিত	মেছোভূত	৬৭৩-৬৭৭
অজেয় রায়	পলাশডাঙ্গার শ্মশানে	৬৭৮-৬৯৩
কণা বসু মিশ্র	হাতুড়ে ডাক্তারের ভুতুড়ে রুগি	৬৯৪-৭০০
গৌরী ধর্মপাল	ভূতের ভয়	৭০১-৭০৪

সুনীল জানা	ভূতের উপকারিতা	৭০৫-৭১১
ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	আকাশ কুসুম	৭১২-৭১৮
মীরা বালসুব্রহ্মমনিয়ম	মাথা মুণ্ডু	৭১৯-৭২৩
শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী	ভূতের রঙ সাদা	৭২৪-৭২৯
পার্থ চট্টোপাধ্যায়	অদৃশ্য হাত	৭৩০-৭৩৪
নবনীতা দেবসেন	স্বপ্নের মতো	৭৩৫-৭৪৮
শৈলশেখর মিত্র	বদলা	৭৪৯-৭৫৪
অশোককুমার মিত্র	জটুর বন্ধু	৭৫৫-৭৫৯
প্রবাস দত্ত	নীল সাহেবের পোড়ো বাড়ি	৭৬০-৭৬৬
শেখর বসু	চোর তাড়াতে ভূত	৭৬৭-৭৭১
মুস্তাফা নাশাদ	ভুতুড়ে ভোটার	৭৭২-৭৭৭
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবুখুড়োর দুধেলা গাই	৭৭৮-৭৮৩
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	আতঙ্কের রাত	৭৮৪-৭৯২
বলরাম বসাক	ভূতের পূত	৭৯৩-৭৯৭
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	জলজ্যান্ত	৭৯৮-৮০৪
শৈবাল মিত্র	তার পায়ের শব্দ	৮০৫-৮১০
শচীন দাশ	অনুতোষের অন্তর্ধান	৮১১-৮১৭
হীরেন চট্টোপাধ্যায়	ভূতের মতোই	৮১৮-৮২৪
নির্মলেন্দু গৌতম	অদ্ভুত	৮২৫-৮৩৩
কার্তিক ঘোষ	পুনুর কাছে	৮৩৪-৮৩৭
শিবতোষ ঘোষ	ভূতের সঙ্গে সাত ঘণ্টা	৮৩৮-৮৪৮
বাণীব্রত চক্রবর্তী	রণ্টুপালিতের মুচকি হাসি	৮৪৯-৮৫৪
সুধীন্দ্র সরকার	দেবতার গ্রাস	৮৫৫-৮৬৪
প্রণব মুখোপাধ্যায়	কাপ্রোর কালো মুক্তো	৮৬৫-৮৭২
রূপক চট্টরাজ	আগন্তুক	৮৭৩-৮৭৪
দেবব্রত দেব	নিশিজট	৮৭৫-৮৮৩
অধীর বিশ্বাস	ভূতের পাল্কি	৮৮৪-৮৯১
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়	বন্দুকরামের সিন্দুক	৮৯২-৮৯৫
শ্রীলতা চট্টোপাধ্যায়	বন্ধু	৮৯৬-৯০১
বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী	ভূতের সঙ্গে কিছুক্ষণ	৯০২-৯০৫
দেবাশিস সেন	তারকবাবুর শখ	৯০৬-৯১২

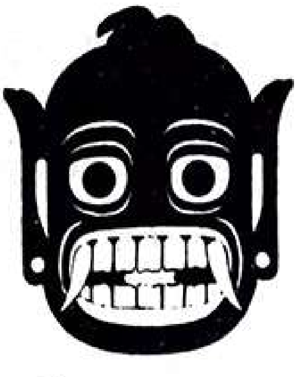

ভীতুভূত

লালবিহারী দে

অনেক কাল আগে এক নাপিত ছিল আর তার বৌ ছিল। কিন্তু তাদের ঘরে সুখ-শান্তি ছিল না। বৌ দিন-রাত ঘ্যান্-ঘ্যান্ করত, “ঐ দেখ, আজও আমার পেট ভরল না!” রাতে বৌয়ের বকাবকির জ্বালায় নাপিত ঘুমোতে পারত না। বৌ কেবলি বলত, “খাওয়াতে পারবে না তো আমাকে বিয়ে করার শখ হয়েছিল কেন! যাদের চালচুলো নেই, তাদের আবার বিয়ে করা কেন! বাপের বাড়িতে দু-বেলা পেট ভরে খেতাম। এখানে এসেছি উপোস করতে। বিধবারা উপোস করে। তুমি বেঁচে থাকতেই কি আমি বিধবা হয়েছি?”

শুধু একথা বলেই থামত না বৌ; মাঝে মাঝে ঝাঁটা তুলে দু-ঘা লাগিয়েও দিত। একদিন ঐ রকম খ্যাংরা-বাড়ি খেয়ে, লজ্জায় অপমানে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে, নাপিত তার ক্ষুরের থলিটি নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল কিছু টাকা-কড়ি না জমিয়ে আর কখনো বৌয়ের মুখ দেখবে না।

সারাদিন গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে, সন্ধ্যাবেলায় নাপিত একটা বনের ধারে পৌছল। সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে সে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে, অনেকক্ষণ ধরে মনের দুঃখ নিয়ে খুব বিলাপ করতে লাগল। এখন হয়েছে কি, ঐ যে গাছে নাপিত ঠেস দিয়ে বসেছিল, সেই গাছে এক ভূত থাকত। গাছের গোড়ায় একটা জ্যান্ত মানুষকে বসে থাকতে দেখে ভূতের যে তার ঘাড় মটকাবার ইচ্ছে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে নেমে, এই লম্বা তালগাছের মতো ভূতটা দু-হাত বাড়িয়ে, এত বড় হাঁ করে, নাপিতের সামনে এসে দাঁড়াল। নাপিতের তো চক্ষু স্থির!

ভূত বলল, "ওঁরে নাঁপিত, এঁবার তোঁর ঘাঁড় মঁটকাব, তোঁকে রঁক্ষা কঁরবে কেঁটা বঁল!"

তাকে দেখেই তো নাপিতের গায়ের রক্ত হিম, চুল-দাড়ি খাড়া! তবু তার মাথা গুলিয়ে গেল না। কে না জানে যে নাপিতদের মতো বুদ্ধি কারো হয় না।

নাপিত বলল, "কি বললি রে পিরেত? আমার ঘাড় মট্‌কাবি নাকি? দাঁড়া, আজ রাতেই তোর মতো কত পিরেত ধরে আমি ঝুলিতে পুরেছি, তোকে একবার দেখাই! তুই এসেছিস্ ভালোই হয়েছে, আমার আরেকটা পিরেত দরকার ছিল!"

এই না বলে নাপিত করেছে কি, থলির ভিতর থেকে একটা ছোট আয়না বের করেছে। সব নাপিতের সঙ্গে থলির মধ্যে একটা কাঠের বাক্স থাকে; তার মধ্যে ক্ষুর, নরুন, ক্ষুরে ধার দেবার জন্য পাথর ইত্যাদি থাকে। তার সঙ্গে একটা করে আয়নাও থাকে। কারণ—খোদ্দেররা দেখতে চায় দাড়ি কেমন কামানো হল। নাপিত তার সেই আয়নাটা বের করে, ভূতের মুখের সামনে ধরে বলল, "এই দেখ্ একটা ভূত! এটাকে ধরে আমি থলিতে ভরেছি। আরো অনেকগুলো আছে। ওরে পিরেত, এবার তোঁকেও ধরে থলিতে বাঁধব, তুই ওদের সঙ্গী হবি।"

আয়নায় নিজের মুখ দেখে ভূতের পিলে চমকে গেল! সে ভাবল তবে তো নাপিত সত্যি কথাই বলেছে! ভূত ধরাই ওর কাজ! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভূত বলল, "ওঁ মশাই, ওঁ নাঁপিত-মঁশাই! আঁপনি যাঁ বঁলেন আঁমি তাঁই কঁরব, কিঁন্তু দোঁহাই আঁমাকে থঁলিতে ভঁরবেন নাঁ। আঁপনি যাঁ চাঁন আঁমি তাঁই দেঁব।"

নাপিত বলল, "তোকে দিয়ে বিশ্বাস কি? কে না জানে ভূতেরা বেজায় মিথ্যেবাদী হয়। মুখে বলবি এক রকম, তারপর কাজের বেলায় অন্য রকম!"

ভূত বলল, "নাঁ নাঁ, নাঁ মঁশাই! আঁমার ওঁপর কিঁরপা কঁরুন! বঁলুন কি চাঁন, যঁদি নাঁ এঁনে দিঁই তঁখন থঁলিতে বাঁধবেন।"

তখন নাপিত বলল, "বেশ, তাহলে এক্ষুণি আমাকে এক হাজার সোনার মোহর এনে দে। আর কাল রাতের মধ্যে আমার বাড়িতে মস্ত এক গোলা তৈরী করে ধান দিয়ে ভরে রাখিস। আগে আমার মোহরগুলো আন্ তো দেখি, নইলে থলিতে ভরব।"

ভূত বলল, "নাঁ বাঁবা, নাঁ, এঁক্ষুণি আঁনছি।" এই বলে কোথায় যেন গিয়ে, একটুক্ষণ বাদেই এক ছালা মোহর এনে নাপিতের সামনে ফেলল। নাপিত ছালা খুলে দেখে তাতে এক হাজার সোনার মোহর! সে তো মহা খুশি!

ভূতকে তখন সে বলল, "দেখিস, কাল রাতের মধ্যে গোলাটা তুলে, ধান ভরতে যেন ভুল না হয়। এখন যেতে পারিস।" ভূত অমনি চোঁ-চাঁ দৌড় দিলো।

ভোর বেলায় ছালার ভারে নুয়ে পড়ে, নাপিত এসে নিজের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এদিকে বৌ তো সারাদিন কেঁদে কেঁদে সারা, কেন সে তার অমন ভালোমানুষ স্বামীকে রাগের মাথায় খ্যাংরা-বাড়ি মেরে বসল? সে ছুটে এসে দরজা খুলে নাপিতের পায়ে পড়ল।

তারপর স্বামী যখন ছালার মুখ খুলে মাটিতে এক পাহাড় মোহর ঢালল বৌয়ের চোখ কপালে উঠে গেল।

পরের রাতে ভূতটা থলি-বাঁধা হবার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নাপিতের বাড়িতে মস্ত একটা গোলা তৈরী করে সারা রাত পিঠে করে ধান বয়ে এনে, গোলা বোঝাই করতে লাগল। ভূতের খুড়ো তাই দেখে জিজ্ঞাসা করল, "ওঁটা কিঁ হঁচ্ছে? ভূঁতের পোঁ হঁয়ে মুঁটের মঁতো ধাঁন বঁয়ে মঁরছিস কেঁন?"

তারপর ভূতের কাছে সব কথা শুনে, খুড়ো বলল, "তুঁইও যেঁমন গাঁধা! ওঁ বঁলল থঁলিতে ভঁরবে আঁর তুঁইও অঁমনি বিঁশ্বাস কঁরলি! তাঁই কঁখনো পাঁরে নাঁকি! তোঁকে বোঁকা পেঁয়ে চাঁলাকি কঁরেছে।"

ভূত বলল, "খুঁড়ো তুঁমি নাঁপিতের ক্ষঁমতাকে সঁন্দেহ কঁরছ? বেঁশ, তঁবে চঁল আঁমার সঁঙ্গে।"

এই বলে নাপিতের বাড়ি গিয়ে দুজনে জানালা দিয়ে উঁকি মারল।

নাপিত কিন্তু দমকা হাওয়া আর সোদা গন্ধ থেকে ঠিক বুঝেছিল জানালার কাছে ভূত এসেছে। অমনি জানালার সামনে সেই আয়নাটাই তুলে ধরে নাপিত বলল, "কিরে পিরেত! আরেকটাকে এনেছিস বুঝি? দাঁড়া! সেটাকেও থলিতে ভরি।"

ভূতের খুড়ো যেই না আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে অমনি তার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়েছে! সে কেঁদে নাপিতকে বলল, "ওঁ বাঁবা! মাঁপ করুন আঁর সঁন্দ কঁরব না! আঁরেকটা গোঁলা কঁরে সেঁটাতে ধাঁনের বঁদলে চাঁল ভঁরে দিচ্ছি, আমাকে ছাড়ান দিন।"

এইভাবে দুটো রাত পোয়াতে না পোয়াতে, নাপিত বড়লোক হয়ে গেল। তারপর স্ত্রী ছেলে-পুলে নিয়ে বাকি জীবনটা সে সুখেই কাটালো।

আমার গল্পটি ফুরোল,
নটে গাছটি মুড়োল।

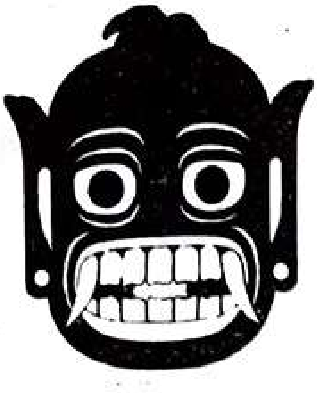

পিঠে পার্বণে চীনে ভূত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

রাধামাধব গুপ্ত তাঁহার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মাতুল ব্রহ্মদেশে কোন স্থানের ডাক্তার ছিলেন। অস্ত্র চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। বৃদ্ধ-বয়সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশে আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া প্রথমে তিনি তীর্থদর্শন করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এখন কলিকাতায় আসিয়া বাসা করিয়াছেন। রাধামাধব সেই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

রাধামাধব নিজেও পাস করা ডাক্তার। কলিকাতায় নহে, অন্য স্থানে তিনি ডাক্তারী করেন। মাতুল মাতুলানীকে তিনি প্রণাম করিলেন। দেখিলেন যে, মাতুল মাতুলানী দুইজনেরই শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে যেন কালি মারিয়া দিয়াছে। দুই জনেই সর্বদা অতি বিমর্ষভাবে থাকেন। মনে মনে যেন সর্বদাই কিরূপ একটা ভয়—কিরূপ একটা দুশ্চিন্তা। রাধামাধব আরও দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুলের মস্তকটি মুণ্ডিত, মাথায় চুল নাই।

তিনি মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বর্মায় আপনি যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানের জলবায়ু কি ভাল ছিল না? আপনারা দুই জনেই অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধহয়, যেন আপনাদের শরীরে কোন একটা রোগ আছে।'

মাতুল উত্তর করিলেন—'না আমাদের শরীরে কোন রোগ নাই।' তিনি কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন।

পরদিন মামা জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাধামাধব, তুমি যে স্থানে ডাক্তারী কর, সে স্থানে দু'পয়সা হয় তো?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'প্রথম প্রথম বেশ দু'পয়সা হইত। তারপর

কোথা হইতে সে স্থানে এক অবতার উপস্থিত হইল, সে অবধি আমার আর বড় কিছু হয় না।'

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন—'অবতার কিরূপ?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'গেরুয়া কাপড় পরা একটা লোক। সেও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। রোগীকে কখনও ডাক্তারী, কখনও হোমিওপ্যাথি, কখন কবিরাজি, কখন হাকিমি, কখন স্বপ্নলব্ধ ভৌতিক ঔষধ প্রদান করে। রোগীর নিকট ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে গল্প করিয়া সে বলে যে—'আমি ভূত নামাইতে পারি, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকিতে পারি।' যে পর্যন্ত এই অবতারটি সে স্থানে আসিয়াছে, সেই অবধি আমার পসার প্রতিপত্তি একেবারে গিয়াছে।'

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে লোকটা ভূত প্রেত সম্বন্ধে যে সমুদয় গল্প করে, তাহা কি মিথ্যা?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'সমুদয় মিথ্যা। ভূত আবার কোথায়? ভূত বলিয়া জগতে কোনরূপ বস্তু নাই।'

মাতুল বলিলেন—'বটে! যদি দেখিতে পাও?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'ভূত দেখিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে একলা শ্মশানে মশানে অনেক ঘুরিয়াছি। একদিন দুইদিন নয়, তিন বৎসর কাল এরূপ চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভূতের চিহ্নমাত্রও আমি দেখিতে পাই নাই। ভূতের গল্প সব অলীক। ভূত বলিয়া জগতে কিছুই নাই।'

মাতুল বলিলেন—'যদি প্রত্যক্ষ তোমাকে দেখাইতে পারি?'

রাধামাধব উত্তর করিলেন—'তাহা হইলে আপনার নিকট আমি চিরঋণী হইয়া থাকিব। পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। যদি ভূত দেখিতে পাই, তাহা হইলে পরকাল সম্বন্ধে আমার মনের সন্দেহ দূর হয়।'

মাতুল বলিলেন—'না তুমি ছেলেমানুষ, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ! কাজ নাই, শেষে একটি বিপদ ঘটিবে।'

রাধামাধব মাতুলকে জোর করিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন—'যদি যথার্থই আপনি আমাকে ভূত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে দেখাইতেই হইবে। আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। আপনার কোন ভয় নাই। আমার মন বিচলিত হইবে না।'

মামা ভাগিনেয়তে যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি দশটা